بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

খুতবা জুম'আ

আঁ হযরত (সা.)-এর সুমহান মর্যাদার অধিকারী বদরী সাহাবা রিযওয়ানুল্লাহ্ আলাইহিম আজমাঈনদের জীবনের ঈমান উদ্দীপক ঘটনার হৃদয় বিদারক বর্ণনা।

ইন্দোনেশিয়ার একজন দীর্ঘ দিন খেদমতকারী ওয়াকেফে জিন্দেগী জামা'তের মুবাল্লেগ সিলসিলার মোকাররম সুয়ূতি আযীয আহ্মদ সাহেব এর উত্তম বর্ণনা।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লণ্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ হতে প্রদত্ত ৩০ নভেম্বর ২০১৮-এর খোতবা জুমা এর সংক্ষিপ্তসার

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন:

আজ যেসব সাহাবীর স্মৃতিচারণ করবো তাদের মাঝে সর্বপ্রথম রয়েছেন, হযরত সাবেত বিন খালেদ আনসারী (রা.)। তিনি বনু নাজ্জারের বনু মালেক গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। তিনি বদর ও ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং ইয়ামামার যুদ্ধে যোগদান করেন, আর এই যুদ্ধেই তিনি শাহাদত বরণ করেন।

এরপর রয়েছেন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উরফাতা (রা.)। তিনি হযরত জাফর বিন আবু তালিবের সাথে ইথিওপিয়ার হিজরতে অংশ নিয়েছেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উরফাতা বদরের যুদ্ধে যোগদান করেছেন।

এরপর রয়েছেন হযরত উতবা বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.), তিনি আকাবার বয়আত, বদর ও ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

এরপর রয়েছেন, হযরত কায়েস বিন আবি সা'সা আনসারী (রা.)। কায়েস ৭০ জন আনসারের সাথে আকাবার বয়আতে যোগদান করেছেন। বদরের যুদ্ধের জন্য যাত্রার প্রাক্কালে মহানবী (সা.) তাঁর সেনাবাহিনীর সাথে মদীনার বাইরে বুয়ুতুস্ সুকিয়া নামক স্থানে যাত্রা বিরতি করেন; এবং স্বল্পবয়স্ক বালক, যারা মহানবী (সা.)-এর সাহচর্যের আগ্রহে তাঁর সাথে এসেছিলেন, তাদেরকে সেখান থেকে ফেরত পাঠানো হয়। সুকিয়া থেকে যাত্রার সময় রসূলে করীম (সা.) হযরত কায়েস বিন আবি সা'সা-কে মুসলমানদের মোট সংখ্যা গণনা করার নির্দেশ দেন, তখন হযরত কায়েস (রা.) মহানবী (সা.) এর গণনার নির্দেশ অনুসারে গণনা করে মহানবী (সা.)-কে জানান যে, তাদের সংখ্যা বা মুসলমানদের সংখ্যা মোট ৩১৩। হুযূর (সা.) এটি শুনে আনন্দিত হন এবং বলেন, তালূতের সাথীদের সংখ্যাও এতটাই ছিল।

একইভাবে বদরের যুদ্ধের দিন মহানবী (সা.) সাকা-র নেতৃত্ব তার হাতে দিয়েছিলেন। সাকা সেনাবাহিনীর সেই অংশ হয়ে থাকে যেটি নিরাপত্তার জন্য বাহিনীর পিছনে অবস্থান করে। একবার তিনি মহানবী (সা.) এর কাছে নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি কতদিনে কুরআনে করীম শেষ করব। তিনি (সা.) বলেন, পনের রাতে। হযরত কায়েস নিবেদন করেন, আমি আমার ভেতর এর চেয়ে বেশি সামর্থ্য আছে বলে মনে করি। তখন তিনি (সা.) বলেন, এক জুমুআ থেকে পরবর্তী জুমুআর মধ্যবর্তী সময়ে একবার পুরোটা পড়তে পার। তিনি (রা.) বলেন, আমি নিজের মাঝে এর চেয়ে বেশি সামর্থ্য দেখতে পাই। এরপর তিনি দীর্ঘ দিন এভাবে কুরআন তিলাওয়াত অব্যাহত রাখেন। তিনি যখন বয়োবৃদ্ধ হয়ে যান আর চোখে ব্যান্ডেজ বা পট্টি বাধার প্রয়োজন হয় তখন পনের রাতে পুরো কুরআন শেষ করা আরম্ভ করেন। তখন তিনি বলতেন যে, হায়! আমি যদি মহানবী (সা.) প্রদত্ত ছাড় শিরোধার্য করতাম তাহলে ভালো হতো।

এরপর রয়েছেন হযরত উবায়দা বিন হারেস (রা.), আরেকজন সাহাবী। তিনি মহানবী (সা.) এর নিকটাত্মীয়দের একজন ছিলেন। তিনি প্রাথমিক যুগে ঈমান আনয়নকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মহানবী (সা.) এর দ্বারে আরকামে প্রবেশের পূর্বেই তিনি ঈমান আনয়ন করেছিলেন। হযরত উবায়দা মহানবী (সা.) এর দৃষ্টিতে বিশেষ পদমর্যাদা রাখতেন। হযরত উবায়দা বিন হারেস প্রাথমিক দিনগুলোতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বনু আব্দে মানাফের

সর্দারদের একজন ছিলেন। হযরত উবায়দা বিন হারেস তার দুই ভাই হযরত তোফায়েল বিন হারেস এবং হযরত হোসাইন বিন হারেসের সাথে মদীনায় হিজরত করেন। মহানবী (সা.) হযরত উবায়দা বিন হারেস এবং হযরত উমায়ের বিন হুম্মামের মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেন। হযরত উবায়দা বিন হারেস ও হযরত উমায়ের বিন হুম্মাম, উভয়েই বদরের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন।

হিজরতের আট মাস পর মহানবী (সা.) হযরত উবায়দা বিন হারেসকে ষাট বা আশিজন অশ্বারোহী সৈন্যের সাথে প্রেরণ করেন। মহানবী (সা.) হযরত উবায়দা বিন হারেসের জন্য সাদা রং-এর একটি পতাকা বাধেন, যা বহন করছিলেন মিসতা বিন আসাসা। এই যুদ্ধাভিজানের উদ্দেশ্য ছিল, অর্থাৎ এই যে সেনাদল বা অশ্বারোহী বাহিনী প্রেরণ করা হয়েছিল, এর উদ্দেশ্য ছিল কুরায়েশের একটি বানিজ্য কাফেলাকে পথিমধ্যে বাধা দেওয়া। কুরায়েশ কাফেলার আমীর ছিল আবু সুফিয়ান। অবিশ্বাসীদের এই কাফেলায় দুইশত ব্যক্তি ছিল, যারা বানিজ্য পণ্য নিয়ে যাচ্ছিল। সাহাবীদের এই জামা'ত রাবেক উপত্যকায় তাদের কাছে পৌঁছে যায়। এই জায়গাকে বিদানও বলা হয়। উভয় পক্ষের মাঝে তির বিনিময় ছাড়া আর কোন যুদ্ধ হয় নি। যুদ্ধের জন্য রীতিমত সারিবদ্ধ হওয়ার সুযোগ হয়নি। মুসলমানদের পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম যে সাহাবী তির চালিয়ে ছিলেন তিনি ছিলেন হযরত সাদ বিন আবি ওক্কাস। এটিই সেই প্রথম তীর ছিল যা ইসলামের পক্ষে চালানো হয়। উবায়দা বিন হারেসের নেতৃত্বে এটি ইসলামের দ্বিতীয় যুদ্ধাভিজান ছিল।

তিনি (রা.) বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষ থেকে ওয়ালিদ বিন উতবার মোকাবিলা করেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত এই ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যেমন- হযরত আলীর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, هٰذٰنِ خَصْمٰنِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ আয়াত তাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে যারা বদরের যুদ্ধের দিন শত্রুর মোকাবিলা করে, অর্থাৎ হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিব, হযরত আলী বিন আবি তালিব, হযরত উবায়দা বিন হারেস, উতায়বা বিন রাবিয়্যা, শায়বা বিন রাবিয়্যা এবং ওয়ালিদ বিন উতবা।

যাইহোক এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিশদ বিরবণ সুনান আবু দাউদে এভাবে দেয়া হয়েছে যে, হযরত আলীর পক্ষ থেকে রেওয়ায়েত রয়েছে, উতবা বিন রাবিয়া এবং তার পিছনে তার পুত্র ও ভাইও বের হয় আর চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলে, আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কে বের হবে? তখন আনসারের বেশ কিছু যুবক এর উত্তর দেয়। উতবা জিজ্ঞেস করে, তোমরা কারা? তারা বলে, আমরা আনসার। উতবা বলে, তোমাদের সাথে আমাদের কোন বিবাদ নেই। আমরা কেবল আমাদের চাচার পুত্রদের সাথে যুদ্ধ করার ইচ্ছা রাখি। তিনি (সা.) তখন বলেন, হে হামজা! উঠো। হে আলী! দাঁড়িয়ে যাও। হে উবায়দা বিন হারেস! এগিয়ে যাও। হযরত আলী বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর কণ্ঠ শুনতেই হযরত হামজা উতবার দিকে অগ্রসর হন এবং আমি শায়বার দিকে আর উবায়দা বিন হারেস ও ওলীদের মাঝে যুদ্ধ হয়। উভয়ই পরস্পরকে মারাত্মকভাবে আহত করে। এরপর আমরা উভয়েই ওলীদের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করি এবং তাকে হত্যা করি আর উবায়দাকে যুদ্ধের ময়দান থেকে উঠিয়ে নিয়ে আসি। এই যুদ্ধ চলাকালে উতবা হযরত উবায়দা বিন হারেসের পায়ের গোছায় প্রচণ্ড আঘাত করায় তার পায়ের গোছা কেটে যায়। মহানবী (সা.) তাকে সেখান থেকে উঠানোর ব্যবস্থা করেন। আর বদরের যুদ্ধের অবসানের পর সাফরা নামক স্থানে (সাফরা বদরের নিকটবর্তী একটি জায়গা) তার ইন্তেকাল হয় আর সেখানেই তাকে দাফন করা হয়। একটি রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত উবায়দার পায়ের গোছা কেটে গিয়ে তা থেকে যখন রক্ত এবং মজ্জা বের হচ্ছিল তখন সাহাবীরা উবায়দাকে মহানবী (সা.)-এর কাছে নিয়ে আসেন। তখন তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি কি শহীদ নই? যুদ্ধে আহত হন, তাৎক্ষণিকভাবে যুদ্ধ-ময়দানে তার শাহাদত হয় নি। তিনি (সা.) তার উত্তরে বললেন, কেন নয়, তুমি অবশ্যই শহীদ। এক রেওয়ায়েত অনুসারে উবায়দা বিন হারেসকে যখন মহানবী (সা.)-এর নিকট নিয়ে আসা হয় তখন তিনি (সা.) স্বীয় উরুতে তার মাথা রাখেন আর এরপর হযরত উবায়দা বলেন, হায়! আজকে যদি আবু তালেব জীবিত থাকতেন তাহলে দেখতে পেতেন যে, তিনি যে দাবি করতেন তার চেয়ে আমি অধিক যোগ্য আর তিনি বলতেন, ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن ابناءنا والحلائل অর্থাৎ এটি মিথ্যা কথা যে, মুহাম্মদ (সা.)-কে আমরা তোমাদের হাতে সোপর্দ করব, এটি কেবল তখনই সম্ভব হবে যদি তার চতুষ্পার্শ্বে আমাদেরকে ধরাশায়ী করা হয় আর আমরা আমাদের স্ত্রী-সন্তানদের সম্পর্কে উদাসীন হয়ে যাই। এটি ছিল তাদের আন্তরিকতা ও আবেগ। শাহাদতের সময় হযরত উবায়দা বিন হারেসের বয়স ছিল ৬৩ বছর।

হুজুর আনোয়ার (আই.) বলেন, এই গুটি কয়েক সাহাবীর স্মৃতিচারণের পর এখন আমি ইন্দোনেশিয়ায় আমাদের একজন দীর্ঘ দিন খেদমতকারী ওয়াকেফে জিন্দেগী জামা'তের মুবাল্লেগের স্মৃতিচারণ করতে চাই, যিনি সম্প্রতি ইন্তেকাল করেছেন। তার নাম হলো সুয়ূতি আযীয আহমদ সাহেব। তিনি ১৯ নভেম্বর তারিখে ইন্তেকাল করেন 'ইন্না

লিলআহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন' । তিনি মারাত্মক হৃদরোগে আক্রান্ত ছিলেন। চিকিৎসার উদ্দেশ্যে তাকে রাবওয়া পাঠানো হয়েছিল। রাবওয়ার তাহের হার্ট ইনস্টিটিউটে তার অনেক বড় একটি অপারেশন হয়। কিছুদিন পর তিনি ১৯ নভেম্বর তারিখে ইন্তেকাল করেন। আরোগ্য লাভ করতে পারেন নি। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তার স্ত্রী, দুজনপুত্র-কন্যা এবং দশজন পৌত্র-পৌত্রি ও দৌহিত্র-দৌহিত্রি রয়েছে। তাদের মাঝে ছয়জন ওয়াকফে নও। সুয়ূতি আযীয সাহেবের জন্ম হয়েছে ১৭ আগস্ট ১৯৪৪ সনে দক্ষিণ সোলাবেসিতে। তিনি ১৯৬৬-এর সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৭১-এর অক্টোবর পর্যন্ত রাবওয়ার জামেয়ায়পড়াশোনা করেছেন। ১৯৭২ সনের এপ্রিলে কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ হিসেবে তিনি ইন্দোনেশিয়ায় নিযুক্ত হন। ১৯৮৫ সনে কর্মক্ষেত্রেই স্বীয় কার্যক্রমের ভিত্তিতে তিনি শাহেদ ডিগ্রীও লাভ করেন। ২০০০ সনে তিনি হজ্জ করারও সৌভাগ্য লাভ করেন। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৯ পর্যন্ত ৭ বছর তিনি দক্ষিণ সুমাত্রা, লামপুং, জাম্বি এবং ব্যাঙ্কুলোতে মুবাল্লেগ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৯ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত মুয়াল্লেম ক্লাসে রীতিমত শিক্ষক হিসে বে সেবা প্রদানের সুযোগ লাভ করেন। ১৯৮১ সনে পূর্বোকিতোতে মুবাল্লেগ হিসেবে তার পদায়ন হয় এবং ১৯৮২ সনে মুয়াল্লেম ও মুবাল্লেগ ক্লাসে সহকারি পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৯৮২ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত জামেয়া আহমদীয়া ইন্দোনেশিয়ার প্রিন্সিপাল ছিলেন আর ১৯৮৫ সনে তাকে শাহেদ ডিগ্রী দেয়া হয়। ১৯৯২ থেকে ২০১৬ সন পর্যন্ত ২০ বছর তিনি মুবাল্লেগ ইনচার্জ ছিলেন। ২০১৬ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জামেয়া আহমদীয়া ইন্দোনেশিয়ার প্রিন্সিপাল হিসেবে সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। ১৯৭৩ সনে তিনি বিয়ে করেন জামা'তের মুবাল্লেগ আব্দুল ওহাব সুমাত্রীসাহেবের মেয়ে আফিফা সাহেবাকে, যিনি ইন্দোনেশিয়ার আমীর আব্দুল বাসেত সাহেবের বড় বোন। তার ঘরে সুয়ূতি সাহেবের চার সন্তান হয়- ওয়ার্দিয়া খালেদ, হারেস আব্দুল বারী, সাদাত আহমদ এবং আলিতা আতীয়াতুল আলীম। আফিফা সাহেবা ২০০৯ সনে ইন্তেকাল করেন। এরপর সুয়ূতি সাহেব আরিনা দামা ইন্তি সাহেবাকে বিয়ে করেন, তার ঘরে কোন সন্তান নেই। তার বংশে কীভাবে আহমদীয়াত এসেছে- সে সম্পর্কে তিনি একবার এমটিএতে ইন্টারভিউ দেন এবং বলেন, আমার এবং আমার বংশের লোকদের বয়আত করার মূল কারণ হলো, আমার দাদা ওসীয়্যত করে গিয়েছিলেন যে, শেষ যুগে ইমাম মাহদী আসবেন। আর তিনি যখন আসবেন তখন তোমরা সবাই তাকে গ্রহণ করবে। এই তাকীদি নির্দেশ পালনের উদ্দেশ্যে আমাদের বংশ দুই বার হিজরত করে। ১৯৫৯ সনে আমাদের বংশ লামপং-এর দিকে হিজরত করে। ১৯৬৩ সনে মৌলানা যেইনী দেহলান সাহেব তবলীগের জন্য লামপং আসেন আর তার সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। তিনি বলেন, ইমাম মাহদী এসেগেছেন। তিনি বলেন, তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, ইমাম মাহদী যে এসেগেছেন এর প্রমাণ কী? তিনি আমাদেরকে 'মসীহ্ আখেরুজ্জামানের সত্যতা' নামে একটি বই দেন আর এ বইটি পড়তে বলেন। আমি যখন এ বইটি পড়লাম তখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, ইমাম মাহদী, যার আসার কথা ছিল, তিনি এসেগেছেন আর সেই ইমাম মাহদী হলেন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)। বস্তুত ১৯৬৩ সনে ১৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে ১৯ বছর বয়সে আমি এবং আমার বংশের ৪০ ব্যক্তি মৌলানা যেইনী দেহলান সাহেবের মাধ্যমে বয়আত করি।

হুজুর আনোয়ার (আই.) বলেন যে, সুয়ূতি আযীয সাহেব বলতেন - রাবওয়া অবস্থানকালে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বেশ কয়েকজন সাহাবীর সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়েছে। সবসময় কোন সাহাবীর সাথে সাক্ষাতের সুযোগ খুঁজতাম এবং কথা বলার সময় তাদের পা টিপে দিতাম। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর সাথে একটি আনন্দঘন সাক্ষাতের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) যখন খেলাফতের আসনে আসীন হন আমরা প্রথমবার তার সাথে সাক্ষাৎ করি আর হুযূরের সাথে কোলাকুলি করি। হুযূর (রাহে.) আমার গালে আলতোভাবে চাপড় দিয়ে বলেন, ইন্দোনেশিয়া থেকে এসেছো, তোমরা অনেক দূর থেকে এখানে এসেছো। সব বিদেশী ছাত্রদেরকে তিনি বলেন, তোমরা সবাই আমার সন্তান। খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.)-এর আধ্যাত্মিক জ্যোতি সব সময় আমাদের সাথে ছিল, একারণে আমাদের যত সমস্যা ছিল সব সহজ হয়ে যায়। খলীফা সালেস (রাহে.) বলেছিলেন, যদি কোন সমস্যা দেখা দেয়, আমার কাছে চলে এসো। তিনি বলেন, যখন ইন্দোনেশিয়া ফিরে যাচ্ছিলাম, যাওয়ার পূর্বে হুযূরের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাই, তখন হুযূর জিজ্ঞেস করেন আপনার কোন কিছুর প্রয়োজন আছে কি? আমি বললাম, আমার কিছু বইপুস্তক দরকার, আমি অফিসে গিয়েছিলাম কিন্তু বই পাই নি। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) নিজ হাতে একটি নোট লিখেন যে, সুয়ূতিকে বইপুস্তক দিয়ে দাও। এরপর রূহানী খাযায়েনের পুরো সেট আমাকে দেওয়া হয় যা এখনো আমার কাছে আছে। যাওয়ার পূর্বে হুযূর (রাহে.) দীর্ঘক্ষণ আমাকে বুকে জড়িয়ে রাখেন আর আমার কানে কানে বলেন, তোমার মনিবের সাথে কখনো অবিশ্বস্ততা করো না, এটিই আমার নসীহত।

ইন্দোনেশিয়ার আমীর আব্দুল বাসেত সাহেব লিখেন, সুয়ূতী আযীয খুবই সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, বিনয়ের

পরাকাষ্ঠা ছিলেন। ধৈর্য ও সহনশীলতার ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় আদর্শ ছিলেন। দোয়াগো, তাহাজ্জুদ গুযার, খোদার ওপর পরম আস্থাশীল, খেলাফত ব্যবস্থা এবং জামা'তের খলীফাদের প্রতি নিষ্ঠা এবং স্বতঃস্ফূর্ত ভালোবাসা ছিল। জামা'তী কাজকে সবসময় নিজের কাজের ওপর প্রাধান্য দিতেন।

তার মেয়ে মারদিয়া সাহেবা লিখেন, আমাদের পিতা সত্যিই পুরো জীবন উৎসর্গ করেছেন তার জীবন জামা'তের কাজে ব্যয় করেছেন। এমনকি আমরা খুব কমই কোন জায়গায় ভ্রমণে গিয়েছি। কিন্তু আমরা বুঝতাম যে, এটিই ওয়াকফে জিন্দেগীদের জীবন। সন্তানদেরকে তিনি এটিই শিখিয়েছেন। একজন ওয়াকফে জিন্দেগীর পুরোটা সময় জামা'তের জন্য। তিনি আরো বলেন, আমাদের পিতার তরবিয়তের রীতি ছিল এই যে, তিনি বেশি নসীহত করতেন না বরং নিজের কর্মের মাধ্যমে ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করতেন। আমার মা যখন অসুস্থ হতেন ধৈর্যের সাথে তার সেবা করতেন। ঘরের কাজও তিনি নিজেই করতেন। রমজানের দিনগুলোতে সেহরী ও ইফতার এর প্রস্তুতিও নিজেই নিতেন। কখনো কাউকে বলতেন না যে, আমার জন্য অমুক কাজটি করে দাও। নিজ হাতে কাজ করার অভ্যাস ছিল। তার মেয়ে আতিয়াতুল আলীম বলেন, আমাদের পিতা সবসময় সত্য বলতেন। সন্তানদের সাথে কখনো মিথ্যা বলতেন না, হাসি-ঠাট্টার ছলেও না। কখনো তাহাজ্জুদ ছাড়তেন না। সবসময় মসজিদে গিয়ে বাজামা'ত নামায পড়তেন। অসুস্থতা ছাড়া তাকে কখনো ঘরে ফরজ নামায পড়তে দেখি নি।

তার দ্বিতীয় স্ত্রী বলেন, রাবওয়া যাওয়ার পূর্বে তিনি আমাকে বলেন এবং সন্তানসন্ততিদেরও বলেন যে, আমার পরিবার পরিজন, আমার ওয়ারিস বা উত্তরাধিকার হলো খেলাফত। আমার জীবন-মৃত্যু জামা'তের জন্য।

জামা'তের মুবাল্লেগ হাসেম সাহেব লিখেন, একবার তিনি আমাদেরকে প্রশ্ন করেন, জামা'তে আহমদীয়ার সত্যতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ কি? তিনি বলেন, আমরা একে একে কুরআনের আয়াত এবং হাদীসের বরাতে সেই প্রশ্নের উত্তর দিই। তিনি আমাদের উত্তর শুনে বলেন, সত্যতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ আমি স্বয়ং অর্থাৎ প্রত্যেক আহমদীর নিজকে মসীহ মওউদের সত্যতার প্রমাণ মনে করা উচিত। অতঃপর তিনি আরো বলেন,আপনারা নিজেদেরকে এতটা যোগ্য করে তুলুন, যেন আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি জামা'তের সত্যতার প্রমাণ হয়ে যায়।

খতুবা গভীর মনোযোগ সহকারে শুনতেন, আমার খুতবা শুনে তা থেকেগুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টস নিয়ে ছাত্রদের সাথে আলোচনা করতেন, এটা নিশ্চিত করতেন যে, তারা পয়েন্টস লিখেছে কিনা আর সব সময় দেখতেন যে, খলীফায়ে ওয়াক্তের কথা বুঝতে পেরেছে কি না আর সব সময় খেলাফতের আনুগত্যের বিষয়ে নসীহত করতেন।

হুজুর আনোয়ার (আই.) বলেন, মরহুম আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মুসী ছিলেন। রাবওয়ায় ইন্তেকাল হয়েছিল, তার মৃত দেহ পাকিস্তান থেকে ২৩ নভেম্বর ইন্দোনেশিয়া পৌঁছে আর ২৪ নভেম্বর কেন্দ্র পারুমে মুসীয়ানের জন্য নির্ধারিত স্থানে তাকে কবরস্থ করা হয়। জামা'তের বন্ধুদের একটা বিরাট শ্রেণি তার জানাযায় গোগদান করেন। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, জান্নাতুল ফেরদাউসে উন্নত পদমর্যাদা তাকে দিন। তার ছেড়ে যাওয়া পরিবার পরিজনকে আল্লাহ্ তা'লা উত্তম ধৈর্য দান করুন। তার সন্তানসন্ততি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তার পদাঙ্ক অনুসরণের তৌফিক দান করুন।

Khulasa Khutba (Bangla) Huzoor Anwar (atba) 30 November 2018

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To .....

.....

From: Ahmadiyya Muslim Mission Nalhati, Piranpara, Birbhum, 731243, W.B